সিনেমা সন্তরণ

রচনা, গ্রন্থনা ও অনুবাদ
রুদ্র আরিফ

ঐতিহ্য

উৎসর্গ

আর্দ্র নির্ভয়

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'
অথবা/এবং
'বড় হও, দীর্ঘ হও, শুধু বেড়ে ওঠো, শুধু বেড়ে...'

সূ চি প ত্র

সূচনা

সাঁতার শাশ্বত :: ১১

স্বয়ং

অপরাজিত কিংবা কাশির দিনগুলো/ সত্যজিৎ রায় :: ১৭

দ্য রিভার নির্মাণকথা অথবা ভারতস্মৃতি/ জ্যঁ রেনোয়া :: ২৩

লকডাউনের ডায়েরি/ পেদ্রো আলমোদোভার :: ৩৫

সময়ের ছাই কিংবা শুরু ও শেষের খসড়া/ থিও অ্যাঞ্জেলোপুলোস :: ৫৩

যুদ্ধের ফাঁকে উঁকি দেওয়া শৈশব/ মারিনা গলদোভস্কায়া :: ৫৮

মাক্সিম/ আলেহান্দ্রো হোদোরোস্কি :: ৬৪

স্মৃতি

স্মৃতির ওজু/ চিশু রিয়ু :: ৭৩

স্মৃতির বুনুয়েল/ মিশেল পিকোলি, ক্যাথরিন দানুয়্যেভ, জ্যান ম্যরো, ফ্রাঙ্কো নিরো, ব্যুলা অগিয়্যে :: ৭৭

আমার ফাসবিন্ডার/ মার্গারিটা ফন ট্রোটা :: ৮৪

আমার জন আব্রাহাম/ আদুর গোপালকৃষ্ণন :: ৯০

চান্তালকে যেমন দেখেছি/ ক্লেরা আথারতোঁ :: ৯৫

সত্তা

আমার কুব্রিক/ মার্টিন স্করসেজি :: ১০৩

বের্নার্দো বের্তোলুচ্চি: সিনেমার আধুনিক নৈরাজ্যবাদী/ রুদ্র আরিফ :: ১০৭

সালাহ আবু সাইফ: মিসরীয় সিনেমার মাস্টার অব রিয়ালিজম/ ইব্রাহিম আল আরিস :: ১১৮

সেৎসুকো হারা: জাপানি সিনেমার শাশ্বত কুমারী/ জেমস কির্কাপ :: ১২৫

লিনো ব্রোকা: ফিলিপিনো সিনেমার হৃৎপিণ্ড/ নোয়েল ভেরা :: ১৩১
পিয়ের পাওলো পাসোলিনি: সিনেমা ও সাহিত্যের চরম নৈরাজ্যবাদী মাস্টার/ রুদ্র আরিফ :: ১৩৬
এমির কুস্তুরিৎসা: সার্বিয়ান ফিল্মমেকার অথবা বিপ্লবী/ রুদ্র আরিফ :: ১৪৫
জ্যুসেপ্পে তোর্নাতোরে: ইতালিয়ান সিনেমার প্রজন্ম প্রতিনিধি/ রুদ্র আরিফ :: ১৫১

সমালোচনা

রিয়ার উইন্ডো/ ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো :: ১৫৯
কায়রো স্টেশন/ অরুণ কুমার :: ১৬৪
নাইটস অব কাবিরিয়া/ রজার ইবার্ট :: ১৭০
দ্য সান ইন অ্যা নেট/ পিটার আরিগ্যান :: ১৭৫
টার্টলস ক্যান ফ্লাই/ রজার ইবার্ট :: ১৮০

সাক্ষাৎকার

দি ফাদারের কাজী হায়াৎকে চাবুক মেরে হত্যা করা হয়েছে/ কাজী হায়াৎ :: ১৮৭
শতবর্ষ আগে একদিন/ চার্লি চ্যাপলিন :: ২৩৩
ট্র্যাজেডি ভালোলাগে, কমেডি পছন্দ করি না/ চার্লি চ্যাপলিন :: ২৩৭
আড্ডায় দুই মাস্টার ফিল্মমেকার/ ফ্রিৎস্ লাং ও জ্যঁ-লুক গোদার :: ২৪২
মুখোমুখি কুরোসাওয়া ও মার্কেস/ আকিরা কুরোসাওয়া :: ২৬১
চাকরির মোহের কাছে পরাজিত হয়েছি/ সৈয়দ সালাহউদ্দীন জাকী :: ২৭১
অভিজ্ঞতার বাইরে চলচ্চিত্র নির্মাণের চেষ্টা থেকে বিরত থেকেছি/ তারেক মাসুদ :: ২৮২
নিজের সিনেমার রাখি না খোঁজ/ সত্যজিৎ রায় :: ২৯৩
অহেতুক কল্পনার জোরে নিম্নবিত্ত জীবনের গল্প বাছাইয়ের প্রতি আগ্রহ নেই/ দারিউস মেহরজুই :: ৩২৪
ইতিহাসও ভীতিকর হয়ে ওঠতে পারে/ ইউসরি নাসরাল্লাহ :: ৩৩০
মানুষের জন্য, মানুষের প্রতি সিনেমা/ আন্দ্রে ভাইদা :: ৩৩৭
মৃত্যু ঘটছে, হায়, স্বয়ং সিনেমার/ সার্জো লিওনি :: ৩৫৫
'তুমি রিকশাওয়ালা হতে পারো না?'/ প্রবীর মিত্র :: ৩৬৬
ফিল্মমেকিং মানে ঝুঁকি নেওয়া/ দানিয়েলা আরবিদ :: ৩৭৫
সিনেমাটোগ্রাফারের রোমাঞ্চ/ বিলি উইলিয়ামস :: ৩৮২
আমার সিনেমায় আগ্নেয়াস্ত্র নয়, মানুষ চাই/ ক্রিস্টোফার ডয়েল :: ৩৯৬

খুশিতে চোখ টলমল করে/ কোহিনূর আক্তার সুচন্দা :: ৪০৪
আইডিয়ার পেছনে ছুটি না আমি/ বাহমান গোবাদি :: ৪১৬
গণমানুষের জন্য সিনেমার পথে/ ইয়রি মেঞ্জেল :: ৪২২
প্রেমিক, স্বামী, ফিল্মমেকার অথবা আমার গোদার/ আনা কারিনা :: ৪৩১
সিনেমা যখন ঝড়ের আগের নীরবতা/ এলিয়া সুলেইমান :: ৪৪১
অন্যতর ইমেজের সন্ধান/ রাজা আমারি :: ৪৪৮
মারোউন: স্বামী, ফিল্মমেকার অথবা দ্রষ্টা/ সুরাইয়া বাগদাদি :: ৪৫৫
সিনেমা, আলজেরিয়া ও বাস্তবতা/ ইয়ামিনা বশির শুইখ :: ৪৬২
ফিরে দেখা জীবন/ জ্যান ম্যরো :: ৪৭৩
অনুতাপ নেই/ লিনা ভের্তমুলার :: ৪৮৫
প্রসঙ্গ তিতান/ জুলিয়া দুকোর্নো :: ৪৯১
আমার অ্যান্টিক্রাইস্ট, আমার লার্স ফন ত্রিয়া/ শার্লট গেইন্সব্যু :: ৪৯৯
সিনেমার শিল্প নিয়ে কথা বলা এক জোচ্চুর আমি/ অরসন ওয়েলস :: ৫০৫
মেমোরিয়া, নিজের শরীরে নিজেই না থাকা ঘিরে/
আপিচাটপং ভিরাসেথাকুল :: ৫৩২

সংযোগ

সিনেমা ও পরাবাস্তববাদ/ রুদ্র আরিফ :: ৫৪১
আফ্রিকান সিনেমা: পরিচয়, সঙ্কট ও উত্তরণের পথ/
হ্যান্স-ক্রিশ্চিয়ান মানকে :: ৫৪৭
অবেরহাউসেন মেনিফেস্টো: নিউ জার্মান সিনেমার সূচনাবিন্দু/ গৌতম :: ৫৫৪
সিনেমার পর্দায় কাব্য-রূপান্তর/ রুদ্র আরিফ :: ৫৫৮

স্ক্রিপ্ট

গাবে/ মোহসেন মাখমালবাফ :: ৫৬৫

সমাপনী

পরিচয় পর্ব :: ৫৯১

সাঁতার শাশ্বত

ইমেজ হেঁটে চলে। ইমেজ কথা বলে। ইমেজে ইমেজে হাত ধরাধরি, নাক ঘঁষাঘঁষি, কখনোবা কুস্তিও। এভাবে রচিত হতে থাকে দৃশ্য। দৃশ্যমালায় ফুটে ওঠে জীবনের বিবিধ রূপ-রস। ফুটে ওঠে বাস্তব। ফুটে ওঠে বাস্তব ছাড়িয়ে কল্পজগতের কাব্য ও শোকগাথা। আর এভাবে তৈরি হতে থাকে সিনেমা।

এ এক ঘোরের জগৎ। এ জগতে কেবলই ডুবে যাওয়া আছে; ভেসে ওঠা বিরল! সিনেমা নামের এই বাস্তব-অবাস্তব-কল্পনা-স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন মিশ্রিত জগতে খাবি খেতে খেতে, এতটুকু নিঃশ্বাসের সুযোগ মিলতেই, বোঝাপড়ার শাশ্বত আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। সেই জাগ্রত আকাঙ্ক্ষার একগুচ্ছ প্রতিচ্ছবি এখানে হাজির করা হলো, গ্রন্থাকারে।

২.

সময় দ্রুত দৌড়ায়! এলোমেলো পড়ে থাকে অনেক কিছু। গোছাতে কখনো কখনো ইচ্ছে করলেও ঝেঁকে ধরে আলসেমি। তবু গোছানো গেল এই পাণ্ডুলিপি। আলাদা বই করা হবে না, এমনটা নিজের কাছ থেকেই জেনে নিয়ে, ইতস্তত পড়ে থাকা নিজের কিছু লেখা ও অনুবাদ ঘিরে *সিনেমা সন্তরণ*। মূল ভাগ করা হলো পাঁচ অধ্যায়ে।

স্বয়ং-এ সিনে-জাদুকরদের নিজেদের লেখার হাজিরা। বাংলা সিনেমাকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিজ পরিচয়ে মহিমান্বিত করা সত্যজিৎ রায়ের ডায়েরি দিয়ে শুরু। *অপরাজিত*-এর শুটিংকালে যেগুলো তিনি টুকে রেখেছিলেন, ইংরেজিতে। তার *আওয়ার ফিল্মস*, *দেয়ার ফিল্মস* বই থেকে। পুরো বইটি অনুবাদ করার ভাবনা ছিল আমার। এইটুকুর পর আর করা হয়নি! সিনেমার পথে আগমনের শুরুতে সত্যজিৎকে অনেক বেশি রোমাঞ্চিত করেছিল যে অভিজ্ঞতা, তা হলো ভারতে,

বিশেষত কলকাতায় এসে ফরাসি মাস্টার ফিল্মমেকার জ্যঁ রেনোয়ার *দ্য রিভার* নির্মাণ। এ নিয়ে রেনোয়ার স্মৃতিগদ্যও থাকল এখানে। অচেনা পরিবেশে একটি সিনেমা কীভাবে গড়ে ওঠে, তার গল্প জানা যাবে, আশা করি। অন্যদিকে, সাম্প্রতিক দুনিয়ায় বাস্তবতার ভিন্নতর পাঠ আমাদের দিয়ে গেল কোভিড-১৯ বা করোনাভাইরাস মহামারি। অনভ্যস্ত লকডাউনের দিনগুলো যেন একইসঙ্গে ছিল পরাবাস্তব ও জাদুবাস্তবের মিশেল। স্প্যানিশ মাস্টার ফিল্মমেকার পেদ্রো আলমোদোভারের সেই দিনলিপি রয়েছে এ অধ্যায়ে; তার জীবনতৃষ্ণা ও স্মৃতিকাতরতার দোলাচলে। গ্রিক মাস্টার ফিল্মমেকার থিও অ্যাঞ্জেলোপুলোসের কথা ভাবলেই তারেক মাসুদের কথা মনে পড়ে যায় আমার; হায়, সড়ক দুর্ঘটনায় কী মহামূল্য জীবনের অপচয়! থিও'র ডিরেক্টর'স নোট তার সিনে-ল্যান্ডস্কেপের সঙ্গে সিনেপাঠকদের গভীরভাবে বোঝাপড়া করার সুযোগ করে দেবে, আশা রাখি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে শৈশব কাটানো রুশ ফিল্মমেকার মারিনা গলদোভস্কায়ার আত্মজীবনীর প্রারম্ভিক অধ্যায়ে দেওয়া হলো উঁকি। শেষে রইল চিলিয়ান-ফ্রেঞ্চ মাস্টার ফিল্মমেকার ও বহুল প্রতিভার অধিকারী আলেহান্দ্রো হোদোরোস্কির নির্বাচিত কিছু জীবনবোধী উক্তি বা মাক্সিম।

সিনেমার নানা মাধ্যমের ওস্তাদ ও সাগরেদদের স্মরণ ঘিরে এ বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়, *স্মৃতি*। শুরুতেই জাপানি মাস্টার ফিল্মমেকার ইয়াসুজিরো ওজুকে স্মরণ করেছেন তার সিনেমার রেগুলার অ্যাকটর চিশু রিয়ু। অন্যদিকে, পরাবাস্তবধর্মিতার জন্য বিশেষ খ্যাতিপ্রাপ্ত, সিনেমার ইতিহাসের সর্বকালের সবচেয়ে প্রভাববিস্তারী ও প্রেরণাদায়ী ফিল্মমেকারদের অন্যতম, স্প্যানিশ-মেক্সিকান ওস্তাদ লুই বুনুয়েলকে ব্যক্তিরূপে চেনা যাবে তার সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রী মিশেল পিকোলি, ক্যাথরিন দানুয়্যেভ, জ্যান ম্যরো, ফ্রাঙ্কো নিরো ও ব্যুলা অগিয়্যের স্মৃতি থেকে। জার্মান সিনেমার 'অবাধ্য শিশু' রাইনার ভের্নার ফাসবিন্ডারকে স্মরণ করেছেন তার সহযোদ্ধা, অভিনেত্রী ও ফিল্মমেকার মার্গারিটা ফন ট্রোটা। ভারতীয় সিনেমার উন্মত্ত বালক, গুরু ঋত্বিক ঘটকের প্রেরণায় নিজ পথে দাপুটে বিচরণকারী, অকালপ্রয়াত মাস্টার ফিল্মমেকার জন আব্রাহামকে নিয়ে লিখেছেন তার স্বদেশি সহযোদ্ধা ও একই গুরুর সাগরেদ, মাস্টার ফিল্মমেকার আদুর গোপালকৃষ্ণন। এ অধ্যায়ের শেষ টেনেছি ফ্রেঞ্চ-মার্কিন ফিল্ম এডিটর ক্লেরা আথারতোঁর স্মৃতি থেকে বেলজিয়ান মাস্টার ফিল্মমেকার চান্তাল আকেরমানের প্রবণতা পাঠের ভেতর দিয়ে।

তৃতীয় অধ্যায়, *সত্তা*। সিনে-ব্যক্তিত্বদের স্বরূপ-সন্ধান। শুরুতেই আমেরিকান মাস্টার ফিল্মমেকার মার্টিন স্করসেজির চোখ দিয়ে তারই স্বদেশি ও অগ্রজ মাস্টার ফিল্মমেকার স্ট্যানলি কুব্রিকের সিনে-দুনিয়ায় মারা হলো ঢুঁ। আরও রইল ইতালিয়ান বিতর্কিত নৈরাজ্যবাদী দুই ওস্তাদ-সাগরেদ সিনে-মাস্টার পিয়ের পাওলো পাসোলিনি ও বের্নার্দো বের্তোলুচ্চি, মিসরীয় বাস্তববাদী ফিল্মমেকার সালাহ আবু সাইফ, জাপানি

অ্যাকট্রেস সেৎসুকো হারা, ফিলিপিনো ওস্তাদ লিনো ব্রোকা, সার্বিয়ান বৈপ্লবিক ফিল্মমেকার এমির কুস্তুরিৎসা এবং ইতালিয়ান সিনেমায় মডার্ন-ক্লাসিক্যাল ফিল্মমেকার জ্যুসেপ্পে তোর্নাতোরেকে ঘিরে বিশদ আলাপ।

সমালোচনা অধ্যায়ে রয়েছে ফরাসি কিংবদন্তি ফিল্মমেকার ফ্রাঁসোয়া ত্রুফোর বিশ্লেষণে হলিউডের 'মাস্টার অব সাসপেন্স'খ্যাত নির্মাতা আলফ্রেড হিচককের *রিয়ার উইন্ডো*; মিসরীয় সিনেমায় নিওরিয়ালিজমের অগ্রদূততুল্য উদাহরণ হয়ে ওঠা সিনেমা, ইউসেফ শাহিনের *কায়রো স্টেশন*; ইতালিয়ান মাস্টার ফিল্মমেকার ফেদেরিকো ফেল্লিনির সিগনেচার ওয়ার্ক *নাইটস অব কাবিরিয়া*; চেক নিউ ওয়েভ ফিল্ম মুভমেন্টের অনবদ্য নমুনা, স্লোভাকিয়ান অকালপ্রয়াত সিনে-বিপ্লবী স্তেফান উহারের *দ্য সান ইন অ্যা নেট* এবং ইরানি মাস্টার ফিল্মমেকার বাহমান গোবাদির মর্মভেদী সৃষ্টি *টার্টলস ক্যান ফ্লাই*– এই পাঁচ সিনেমা নিয়ে আলোচনার বিস্তার।

সাক্ষাৎকার অধ্যায়ের শুরুটা বাংলাদেশি সিনেমার এক রাগি নির্মাতা, স্বমহিমায় একইসঙ্গে খ্যাতিমান ও বিতর্কিত, তুমুল ব্যবসাসফল ও চরম ফ্লপ– তথাকথিত বাণিজ্যিক সিনেমার দুই রূপেরই স্বাদ তীব্রভাবে পাওয়া কাজী হায়াতের দীর্ঘ আলাপচারিতা দিয়ে। এ অধ্যায়ে আরও রয়েছে সিনেমার ইতিহাসের মহান বিস্ময়বালক চার্লি চ্যাপলিনের দুটি সুপ্রাচীন সাক্ষাৎকার। দুই কিংবদন্তির পরস্পর মুখোমুখি জমে ওঠা গভীরবোধী দুটি আড্ডাও রয়েছে এখানে। একটিতে 'মাস্টার অব ডার্কনেস'খ্যাত অস্ট্রিয়ান ফিল্মমেকার ফ্রিৎস্ লাংয়ের মুখোমুখি ফ্রেঞ্চ নিউ ওয়েভ সিনেমার পোস্টার বয় জ্যঁ-লুক গোদার; অন্যটিতে এশিয়ান সিনেমাকে পশ্চিমা পরিসরে প্রথমবার বড় ধরনের পরিচিতি এনে দেওয়া জাপানি ফিল্মমেকার আকিরা কুরোসাওয়ার সম্মুখে নোবেলজয়ী কলম্বিয়ান সাহিত্যিক গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেস। নিজের সিনেমার অভিনেত্রী, তারপর প্রেমিকা, তারপর স্ত্রী, তারপর মর্মান্তিক বিচ্ছেদ– ফিল্মমেকারদের কারও কারও জীবনে কোনো কোনো অ্যাকট্রেসকে ঘিরে এমনটা ঘটে; যদিও খুব বেশি নয়। আর সিনেমার ইতিহাসে তা দাগ কেটে যায় খুব কমই। এমনই বিরল দুই ফিল্মমেকার-অ্যাকট্রেস সম্পর্কের গহীনে ঢুঁ মারা গেল– ডেনিশ-ফরাসি আনা কারিনার স্মৃতিচারণে গোদার এবং লেবানিজ সুরাইয়া বাগদাদির স্মৃতিতে মারোউন বাদদাদির গল্পসূত্রে। আরও রয়েছে বাংলাদেশি সিনেমার ট্র্যাজিক হিরো ও প্রেরণাদায়ী ফিল্মমেকার তারেক মাসুদের কাছ থেকে তরুণ ফিল্মমেকারদের জন্য সিনেমার সহজপাঠ, পশ্চিমা দর্শকদের মুখোমুখি সত্যজিৎ রায়, যার সিনেমা দিয়ে রোপিত হয়েছিল ইরানি নিউ ওয়েভ মুভমেন্টের বীজ– সেই মাস্টার ফিল্মমেকার দারিউস মেহরজুইয়ের সঙ্গে সন্ধ্যাযাপন, সাম্প্রতিক আরব স্প্রিংয়ের নির্মম সাক্ষী ও মিসরীয় মাস্টার ফিল্মমেকার ইউসরি নাসরাল্লাহর বাস্তবদর্শন, স্পাগাত্তি ওয়েস্টার্ন

ফিল্ম ধারার প্রবর্তক হিসেবে খ্যাত ইতালিয়ান ওস্তাদ সার্জো লিওনির সঙ্গে আলাপ। রয়েছে পোলিশ কিংবদন্তি ফিল্মমেকার আন্দ্রে ভাইদা, সিনেমার ইতিহাসের প্রথম যুগের যোদ্ধা ও প্রখ্যাত ব্রিটিশ সিনেমাটোগ্রাফার বিলি উইলিয়ামস, চেক নিউ ওয়েভের দুর্ধর্ষ কারিগর ইরি মেঞ্জেল, ফিলিস্তিনি মাস্টার ফিল্মমেকার এলিয়া সুলেইমান, তিউনিসীয় সিনেমার এ কালের কণ্ঠ রাজা আমারি, সন্ত্রাসবাদী দুঃসহ বাস্তবতায় আলজেরিয়ান সিনেমার কারিগর ইয়ামিন বশির শুইখ, ফরাসি কিংবদন্তি অভিনেত্রী জ্যান ম্যরো, ইতালিয়ান মাস্টার ফিল্মমেকার লিনা ভের্তমুলার এবং ফরাসি সাম্প্রতিক বিস্ময়জাগানিয়া নির্মাতা জুলিয়া দুকোর্নোর সাক্ষাৎকার। হলিউডের মাস্টার ফিল্মমেকার অরসন ওয়েলসের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার রইল এই দীর্ঘতম অধ্যায়ের শেষ দিকে। তার আগে-পরে আরও রইল বাংলাদেশি সিনেমায় বিস্ময়-জাগানিয়া সৃষ্টি *ঘুড্ডি*র নির্মাতা সৈয়দ সালাহউদ্দীন জাকী, ক্যারেক্টার-অ্যাকটর হিসেবে অসংখ্য সিনেমায় হাজির থাকা বাংলাদেশি অভিনেতা প্রবীর মিত্র, লেবানিজ-ফরাসি ফিল্মমেকার দানিয়েলা আরবিদ, এ কালের প্রবাদপ্রতিম সিনেমাটোগ্রাফার ক্রিস্টোফার ডয়েল, *বেহুলা*খ্যাত বাংলাদেশি অভিনেত্রী কোহিনূর আক্তার সুচন্দা, ইরানি ফিল্মমেকার বাহমান গোবাদি, দুঃসাহসী ব্রিটিশ-ফরাসি অভিনেত্রী শার্লট গেইন্সব্যু এবং এশিয়ান সিনেমায় নতুন বোধ-জাগানিয়া থাই ফিল্মমেকার আপিচাটপং ভিরাসেথাকুলের সাক্ষাৎকার।

সিনেমায় পরাবাস্তববাদ, আফ্রিকান সিনেমার সময়চিত্র, নিউ জার্মান সিনেমা মুভমেন্টের ইশতেহার এবং সিনে-পর্দায় কবিতার অ্যাডাপটেশনের হাজিরা রইল *সংযোগ* অধ্যায়ে।

সবশেষে *স্ক্রিপ্ট* অধ্যায়। ইরানি মাস্টার ফিল্মমেকার মোহসেন মাখমালবাফের কাব্যিক সৃষ্টি *গাবে*র পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্য নিয়ে।

সিনেমার এই বিবিধ বিস্তারী ভুবনে, প্রিয় পাঠক, আপনাকে সুস্বাগতম...

রুদ্র আরিফ
ঢাকা, বাংলাদেশ
৬ জুলাই ২০২৩

স্বয়ং

সিনেমা সন্তরণ ১৫

স ত্য জি ৎ রা য়

অপরাজিত কিংবা কাশির দিনগুলো

১ মার্চ ১৯৫৬ [*অপরাজিত*র শুটিং]

ঘাট খোঁজার জন্য ভোর পাঁচটায় বের হলাম। সূর্য ওঠতে এখনো আধঘণ্টা বাকি; তবু কী যে আলো, কী যে কর্মচাঞ্চল্য... ভাবা যায় না! বুঝলাম, যারা সবার আগে স্নান করতে চান, তারা ভোর চারটায়ই চলে এসেছেন। পায়রাগুলোর কর্মচাঞ্চল্য শুরু হয়নি এখনো; তবে কুস্তিগীরদের হয়েছে। অতুলনীয় পরিবেশ। এর মধ্য দিয়ে পরিশুদ্ধ ও সজীব হওয়ার জন্য এ কাজে কেবলই নিমগ্ন হতে ইচ্ছে করছে। প্ল্যানিং,

সত্যজিৎ রায়

[ফিল্মমেকার, ভারত; ২ মে ১৯২১–২৩ এপ্রিল ১৯৯২]

সাইট ও এক্সট্রা যোগাড়, ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন সেটআপ, অ্যাকশন বলার জন্য প্রস্তুতি– এসব ভাবনা ভাল্লাগছে না। তবু এখানে, যদি কোনোখানে একটি সত্যিকারের 'উদ্দীপক' সেটিং পাওয়া যেত! ঘাটগুলো যে চমৎকার কিংবা রোমাঞ্চকর কিংবা অনন্য– এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে না। সে জন্য আপনাকে এগুলোর অনন্যতা, এগুলোর প্রভাব বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজন পড়বে। যতই নিরীক্ষা করবেন, ঘাটগুলো তত বেশি ভাঁজ খুলে দেবে; তত বেশি জানতে পারবেন– আপনার ফ্রেমে কতটুকু রাখবেন আর কতটুকু দেবেন বাদ।

দুপুরে এই একই ঘাটগুলোকে একেবারেই ভিন্ন লাগে। কাঠের ধাপগুলোর ধূসরবর্ণ গিরিমাটির ওপর সাদা তালি হয়ে রয়েছে একগুচ্ছ নিশ্চল জানালা। পুণ্যস্নানের হুড়োহুড়ি নেই। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আলোটাও আলাদা। ঘাটগুলো পূর্বমুখী। সকালে এগুলো সূর্যের আলো সামনে থেকে পুরোপুরি পায়; সরাসরি ছায়ার খেয়ায় চলাফেরার অনুভূতি হয়ে ওঠে সুতীব্র। বিকেল চারটায় সূর্য চলে যায় উঁচু দালানের ওপারে, আর তার ছায়া পৌঁছায় ঘাটের ওপার পর্যন্ত। ফলাফল: সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত একটি সুবিস্তৃত আলো কর্মচাঞ্চল্যের বশীভূত প্রকৃতির সঙ্গে নিখুঁতভাবে মানিয়ে যায়। ঘাটে সকালের দৃশ্যের শুটিং সকালে এবং দুপুরের দৃশ্যের শুটিং দুপুরেই করতে হবে।

২ মার্চ ১৯৫৬

গলি খুঁজে পেয়েছি বাঙালিটোলায়। গণেশ মহল্লার গলিগুলোই সম্ভবত সবচেয়ে ফটোজেনিক। কীভাবে? গলিগুলোর বাঁক, বাড়িগুলোর ভাঙাচোরা সম্মুখভাগ, দরজা, জানালা, রেলিং, বারান্দা, কলাম ইত্যাদি সৃষ্ট নকশা– আলো এখানে কোয়ালিটির প্রশ্নে অভিন্ন; তা ছাড়া, এখানকার কোনো দুপুরের শটকে কেউ সকালের ভেবে ভুল করতে পারে।

এলাকার লোকজনের সঙ্গে কথা বললাম আমরা। তারা কথা দিলেন সহযোগিতা করার। এখানে আর কোথায়-ই-বা থাকব? আসলে এখানকার বাসিন্দাদের কৃপা পেয়েছি। তাদের সঙ্গে অবশ্যই সর্বাধিক সতর্কতার সঙ্গে আচরণ করতে হবে আমাদের। সামান্যতম অসতর্কতাও সম্পূর্ণ কর্মপ্রচেষ্টাকে ভেস্তে দিতে পারে।

৩ মার্চ ১৯৫৬

বিশ্বনাথ মন্দিরের মোহন্ত লক্ষ্মীনারায়ণের কাছ থেকে ডাক এসেছে। উদ্দেশ্য–

মন্দিরের ভেতরে শুটিং করার সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে তাকে রাজি করানো (এর আগে কখনো এমনটা করিনি আমরা)। পান্ডে, মানে আমাদের মধ্যস্থতাকারী বারবার বলে দিয়েছেন, যেন আমি 'মৌনতা' প্রকাশ না করে বরং 'ব্যক্তিত্ব রক্ষা' করি। তিনি নিশ্চিত, তাতে কাজ হবে। ঝামেলা বাধল দুটি বিষয়ে: ১. আমি তেমন শুদ্ধভাবে হিন্দি বলতে পারি না, আর মোহন্ত হিন্দি ছাড়া অন্য কোনো ভাষা তেমন বোঝেন না; এবং ২. ঘটনা হলো, আমাদেরকে যে চেয়ারগুলোতে বসতে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো আসলে ছারপোকার সর্বোচ্চ স্বস্তির জন্যই নকশাকৃত!

মনে হচ্ছে, মোহন্ত মহাশয়ের নিশ্চল মাথাটির প্রসন্নদায়ক নাড়া দেখতে হলে তার কাছে আরও অন্তত দুই বার যেতে হবে।

মন্দির থেকে ফেরার পথে আমাদের থামানো হলো। বলা হলো, আমরা সপ্তর্ষি আরতির সময়ে এসে পড়েছি। এ এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। যে এটা মিস করবে, সে অডিও-ভিজ্যুয়ালের একটি গ্রেট ট্রিটমেন্টকে মিস করবে। হায়, এই বর্তমান সিনেমাটিতে একটি ডেকোরেটিভ ম্যানার ছাড়া একে আর কোনো কাজে লাগাতে পারব না আমি!

৪ মার্চ ১৯৫৬

দুর্গা মন্দিরে গিয়েছিলাম। এখানে যারা প্রার্থনার পবিত্র উদ্দেশে আসেন, তারা সাধারণত তা করেন অর্ধমনোযোগে; বাকি অর্ধেক মনোযোগ থাকে বানরগুলোর দিকে। এই প্রাণীগুলো এখানে এমনভাবে বিচরণ করে, যেন এ জায়গার মালিকানা ওদেরই। অসম্ভব মজা করতে করতে মাঝে মধ্যে হয়তো আপনার চীনাবাদামের ব্যাগটি কেড়ে নেবে ভয়ংকর হিংস্রতায়। তবে ওরা যখন ঘন্টির তারে দোল খায় এবং আচমকা 'ঘণ্টাধ্বনি' বাজায়, তা দেখতে ও শুনতে শুধুই কমিক থাকে না।

এখানে অপু [*অপরাজিত*র চরিত্র] সহকারে একটি দৃশ্য করার প্রবল সম্ভাবনা দেখছি।

৮ মার্চ ১৯৫৬

স্ক্রিপ্ট ঠিকঠাক করছি। ওপেনিং শট সব সময়ই ঝামেলার। প্রেক্ষাপট প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে লং শটকে ক্লিশে লাগে। কিন্তু বেনারসে [কাশিতে] ওপেন হওয়া কোনো ফিল্মে

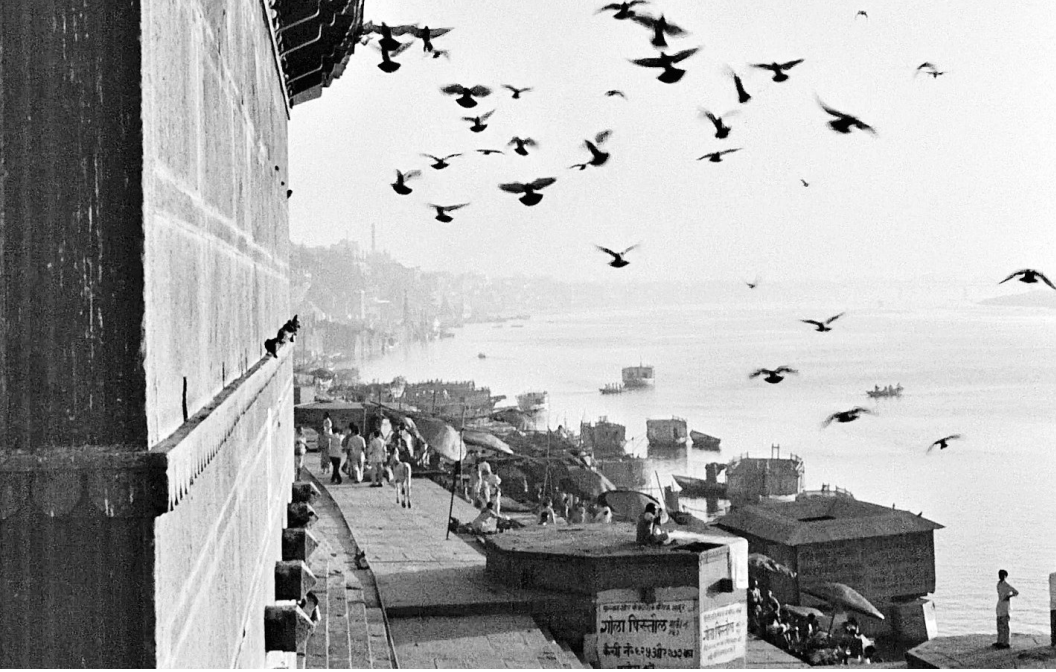

অপরাজিত

এগুলোকে পুরোদস্তুর প্রয়োগ করা ঠিক হবে কি? এমনটা না করার প্রবল ইচ্ছে রাখি। *পথের পাঁচালী*তে স্ক্রিপ্ট টাইট না হওয়ায় ব্যাপারটি কাজে লেগেছে বলে মনে হয় আমার। এই পরিস্থিতিতে কাজ করার ক্ষেত্রে নিজের মাথায় ধারণ করা একটি বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনার ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে ইমপ্রোভাইজেশনের জন্য প্রচুর জায়গা রাখা দরকার।

১৫ মার্চ ১৯৫৬

পায়রার শুটিং করতে ভোর পাঁচটায় ঘাটে এলাম। অবিস্মরণীয় ব্যর্থতা। কার্নিশে নিজেদের দাঁড় থেকে ঝাঁক বেঁধে উড়ে যাওয়া পায়রাগুলো আকাশে বিশাল বৃত্তাকারে পাক খাবে– যেমনটা ওরা খায়– শটটা এ রকম হওয়ার কথা ছিল। ফুটালে পায়রাগুলো উড়তে শুরু করবে– এমন কাজে লাগার মতো বোমা ছিল আমাদের কাছে। ক্যামেরা রেডি ছিল। ফিউজে আগুন দিতে ম্যাচ হাতে প্রস্তুত ছিল সুবীর।[১] আর বড় জোর আধ-মিনিটের মামলা। নিমাই[২] তখন উন্মাদের মতো এক অবর্ণনীয় ইশারা করতে থাকল। আমরা বুঝতে পারলাম, কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। বোমার বিস্ফোরণ

আটকাতে গিয়ে অবিরাম মূকাভিনয় ফুটে ওঠল সুবীরের মুখে। বোমাটি ফাটল, পায়রাগুলো অনবদ্য পারফর্ম করল; কিন্তু ক্যামেরা চালু হলো না! পরে আবিষ্কার করলাম, ব্যাটারির সঙ্গে মোটরের কানেকশন হয়নি।

ভাগ্য ভালো, তিন-চারটি পাঁক খেয়ে পায়রাগুলো তাদের দাঁড়ে ফিরে এলো। আমাদের কাছে বোমা ছিল মোট চারটি। দ্বিতীয় বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শটটা নিতে পারলাম।

মোগলসরাই শহরের অভিমুখী নয়টার ট্রেনে ওঠলাম। ভবতরন আঙ্কেল চরিত্রে অভিনয়ের জন্য আমাদের সঙ্গী হয়েছেন রমণী বাবু। বেনারসের অধিবাসী এই ৭০ বছর বয়সী লোকটিকে ঘাট থেকে তুলে এনেছি। আরও আছেন করুণা ও পিংকি। একটি তৃতীয় শ্রেণির বগির ভেতরে শুটিং। ভবতরনের সঙ্গে বেনারস ছেড়ে যাচ্ছে অপু আর সর্বজয়া। ট্রেনটি ব্রিজ ক্রস করছে। এস. [সর্বজয়া] আর এ. [অপু] বাইরে তাকিয়ে আছে জানালা দিয়ে। বি. [ভবতরন] কমলা খাচ্ছে, থু করে বিচি ফেলছে জানালার বাইরে। বুড়োকে আমরা একটা কমলা দিলাম; কিন্তু ক্যামেরা রেডি হওয়ার আগেই তিনি সেটি সাবাড় করে দিলেন! অতএব, আরেকটি দেওয়া হলো। শট 'ওকে'; প্রত্যাশামতোই 'ট্রাই-এক্স' পারফরম্যান্স পাওয়া গেছে।

২০ মার্চ ১৯৫৬

চৌষট্টি ঘাটের সিঁড়িতে হরিহরের মুখ থুবড়ে পড়ার দৃশ্যটির শুট করলাম। বেশ সন্তোষজনক। নদীর বুক থেকে প্রবল বাতাস তেড়ে এসেছে, আর তা শটের মুভমেন্টকে করে দিয়েছে ঋদ্ধ। কানু বাবুর [হরিহর চরিত্রের অভিনেতা] ভূপাতিত হওয়াটা চরম বাস্তবধর্মী হয়েছে; বাজেভাবে হাঁটু ছিলে গেছে তার।

নদীতে তীর ও ক্যামেরার কাছাকাছি মৃতদেহটি রাখা হয়েছে। স্নানার্থীদের বিরক্ত করা হয়নি। (এখানে) এটি সম্ভবত একটি অভ্যস্ত দৃশ্য।

২২ মার্চ ১৯৫৬

নদী থেকে পানি আনছে অপু– এই দৃশ্য দিয়ে শুটিং শুরু করেছি সকাল সাড়ে পাঁচটায়। অপুকে ফোরগ্রাউন্ডে আর নিসঙ্গ এক কুস্তিগীরকে দূরের ব্যাকগ্রাউন্ডে

রেখে অন্য কোনো ফিগার ছাড়াই লং শট নেওয়ার আইডিয়া ছিল। কিন্তু স্নানার্থীরা ইতোমধ্যে চলে এসেছেন। শট শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত পানি থেকে দূরে, এবং ক্যামেরা-ফিল্ডের বাইরে থাকতে তাদের রাজি করাতে বেশ বেগ পেতে হলো আমাদের।

ঘাট থেকে শুরু করে গলি। বন্ধুদের সঙ্গে অপুর লুকোচুরি খেলা দিয়ে দৃশ্যটির শট শেষ। লং শটের জন্য গলি থেকে অপ্রয়োজনীয় (সজীব ও নির্জীব) উপাদানগুলো পরিষ্কার করা বেশ ঝক্কির ছিল। বিকাল চারটায় প্যাকআপ করে আরতির শুটিং ও রেকর্ডিং করতে সরাসরি চলে গেলাম বিশ্বনাথ মন্দিরে।

মন্দিরের উল্টোদিকের গলির এক বাড়িতে টেপ রেকর্ডার পেতেছে দুর্গা। মাইক্রোফোন, এবং ভেতরকার পুজো মণ্ডপের মাত্র দক্ষিণাদ্বার পর্যন্ত পৌঁছা ৯০ ফুট লম্বা ক্যাবল নিয়ে দেবীর ভক্তদের ভীড় ঠেলে পোকার মতো এগিয়েছে মৃণাল। আরতির সদ্যসজ্জিত প্রতিমা দেখার জন্য ঠেলাঠেলি করা এবং নিজেদের গলা বাড়িয়ে রাখা জনতাকে সামাল দিতে সাময়িক বেষ্টনী বাড়ানোর কাজে ব্যস্ত মন্দিরের পরিচারকেরা। আমরা অপেক্ষমাণ; ঘামছি, আর ক্যামেরার স্পর্ধিত অসামঞ্জস্যের ব্যাপারে ব্যাপক সচেতন আছি।

সময় এলো। দম নিলাম আমরা। অসাধারণ ভজনগীত শুরু হলো। কানে তালা লাগিয়ে দেওয়ার মতো উচ্চস্বরের ভেতর শুধু নিজের চিৎকার করে 'স্টার্ট' ও 'কাট' বলাটা শুনতে পেলাম আমি।

এক ঘণ্টা ধরে আরতি চলল। শেষ হতেই নিজেদেরকে ও আমাদের র'-স্টককে খুঁজে পেলাম নিঃশেষ অবস্থায়। যখন প্যাকআপ করব, এমন সময় মোহন্তের কাছ থেকে নির্দেশ এলো, আমরা যা রেকর্ড করেছি, তিনি শুনতে চান। যন্ত্রপাতি তার অ্যাপার্টমেন্ট পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাওয়া এবং তার কাছে গিয়ে সাউন্ড বাজিয়ে শোনানোর মতো ভালো মানুষটি হওয়া কি ঠিক হবে আমাদের?

যন্ত্রপাতি নিয়ে মোহন্তের আবাসে পৌঁছতে লাগল আধঘণ্টা। আরও আধঘণ্টা লাগল সেগুলো ইনস্টল করতে। এক ঘণ্টার পুরোটা বাজিয়ে শোনানোর পর প্যাকআপ হলো। এই মহাশয়ের ওখান থেকে যখন ফেরার পথ ধরলাম, সময় তখন পৌনে এগারোটা। আসার বেলায় হেসে সম্মতি দিলেন তিনি। আমাদের বকশিশ দেবেন– সে আশাও অনেকটা করে বসেছিলাম আমি!

মূল শিরোনাম: **এক্সট্রাক্টস ফ্রম অ্যা বানারাস ডায়েরি**
গ্রন্থ: **আওয়ার ফিল্মস দেয়ার ফিল্মস**/ সত্যজিৎ রায়। ১৯৭৬

জ্যঁ রে নো য়া

দ্য রিভার নির্মাণকথা অথবা ভারতস্মৃতি

একদিন একেবারেই ঘটনাচক্রে *নিউইয়র্কার*-এ একটা রিভিউ পড়ে বেশ কৌতূহল জাগল। ব্রিটিশ সাহিত্যিক রুমার গডেনের[৩] *দ্য রিভার*-এর রিভিউ। বিশ্বযুদ্ধকাল থেকে প্রকাশিত সেরা উপন্যাসগুলোর একটি হিসেবে একে অভিহিত করেছিলেন রিভিউয়ার। বইটি পড়লাম। দারুণ লাগল। তা শুধু লেখার জাদুমন্ত্রের কারণেই নয়; বরং কাহিনিটি আমার কাছে এমন এক উঁচুমানের সিনেমার ভিত্তি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা

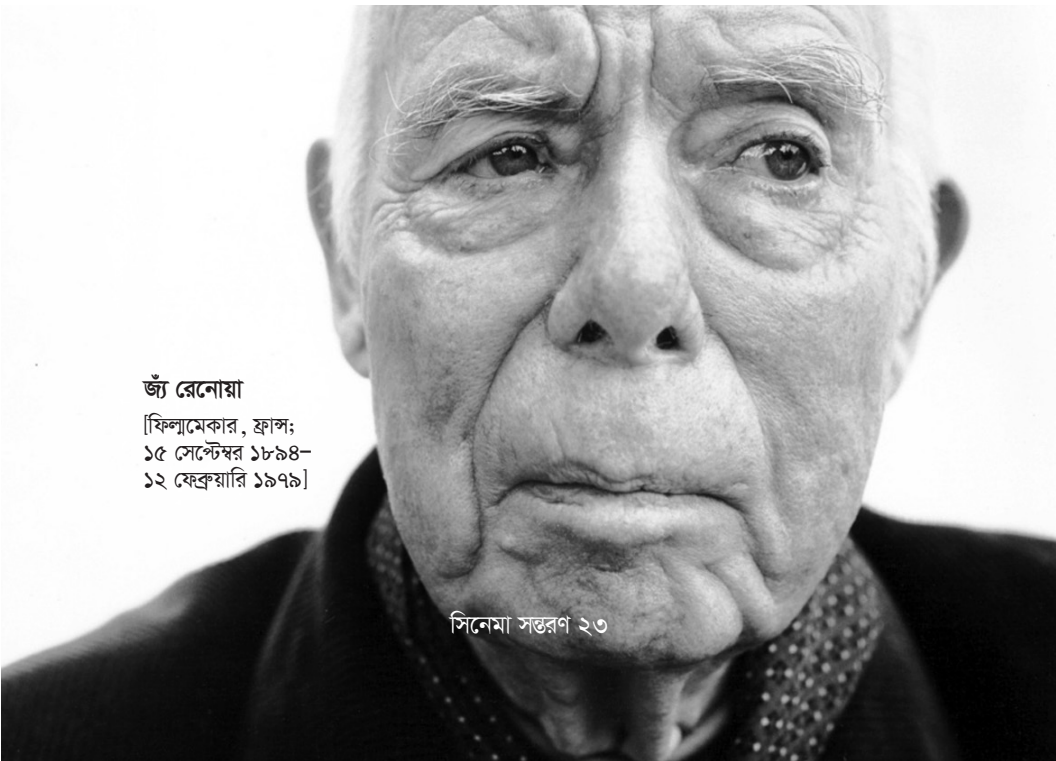

জ্যঁ রেনোয়া
[ফিল্মমেকার, ফ্রান্স;
১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪–
১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯]

জাহির করল, যে সিনেমা অন্তত হলিউডের ফিল্ম ম্যাগনেটদের কাছে সমাদর পাবে। কেননা, এই উপন্যাসে একটি রোমান্টিক প্রেক্ষাপটে দেখানো হয়েছে শিশুদের: বাচ্চা মেয়েগুলোর কাছে ভালোবাসা ধরা দেওয়া; সাপের প্রতি ভীষণ অনুরাগী এক ছোট্ট বালকের মৃত্যু; পিচ ফলের গাছে ঝুলে থাকা ফলের মতো নির্বোধ মর্যাদা নিয়ে ভারতে এক ইংরেজ পরিবারের জীবনযাপন; সবচেয়ে বড় কথা, ভারতের স্বয়ং নিজ ইগজোটিক নৃত্যকলা ও পোশাক-পরিচ্ছদ– এই সবকিছু আমার কাছে একটি ভরসা-জাগানিয়া নিরপেক্ষতার জায়গা হিসেবে ধরা দিলো।

বুঝে গেলাম, আমার জন্য হলিউডের দরজা আবারও খুলে দেওয়ার সম্ভাবনা রাখে– এমন কাহিনির খোঁজ পেয়ে গেছি। তাই আমার অ্যাজেন্টকে বলে দিলাম, যেন সিনেমার স্বত্ব কিনতে গেলে একটি বিকল্প হিসেবে *দ্য রিভার*-এর কথা বিবেচনা করেন। তিনি আমাকে নিরস্ত করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালালেন। বললেন, 'ভারত মানেই শুধু হাতি আর বাঘ শিকার; এর বাইরে তো কিছুই দেখি না। এই গল্পে কি বাঘ শিকারের প্লট আছে?' এই তুরুপের তাসের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তাকে বললাম, যেন তিনি বেশ কয়েকটি স্টুডিওতে *দ্য রিভার*-এর প্রস্তাব নিয়ে ধর্ণা দেন এবং যেকোনো মূল্যে একটি অপশন নিশ্চিত করেন। আগ্রহ দেখাবেন– এমন সম্ভাব্য সব প্রডিউসারের কাছেই আমাকে ধর্ণা দেওয়ালেন তিনি; কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে একই জবাব: হাতি আর বাঘ শিকার ছাড়া ভারত তো আসলে ভারতই না! প্রায় হাল ছেড়ে দিয়ে একদিন বেভারলি হিলসের এক দোকানদারের কাছে হাজির হলাম। কেননা, সিনেমাটি প্রযোজনা করার আগ্রহ দেখিয়েছেন তিনি।

কেনেথ ম্যাকএলডাউনি[৪] ছিলেন ফুল ব্যবসায়ী। সিনেমা ভালোবাসেন। ভারতের প্রতি ভালোবাসা আছে তার। সেই ভালোবাসা অন্তস্তল থেকে খাঁটি। তার স্ত্রী মেলভিনা পাম্প্রে[৫] ছিলেন সুইমিং স্টার এসথার উইলিয়ামসের[৬] জনসংযোগ প্রতিনিধি। স্ত্রীর সূত্রে সিনেমা দুনিয়ার অনেকের সঙ্গেই যোগাযোগ ছিল ম্যাকএলডাউনির। তা ছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ভারতে একটি ইউএস এয়ার ফোর্স অফিসে কর্মরত ছিলেন। নিজের পদাধিকারের কারণে সে সময়ে ভারতের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিককে সেবা দিতে পেরেছিলেন। বিনিময়ে তাদেরকে বলেছিলেন, ভারত নিয়ে তিনি যে সিনেমা প্রযোজনা করবেন, সেটিতে তারা যেন অর্থলগ্নি করেন। তাদের দৃষ্টিতে প্রস্তাবটির বেশ দারুণ সুবিধা ছিল। দেশ থেকে নিজেদের টাকা বাইরে পাঠানো তাদের পক্ষে ছিল বেআইনি; তবে বৈদেশিক মুদ্রা কামানোর সুযোগ এনে দেবে– এমন কোনো সিনেমায় অর্থলগ্নি করা থেকে কোনোকিছুই তাদেরকে আটতে পারেনি।

অভাব ছিল শুধু মনের মতো একটি কাহিনি পাওয়ার। হাতি শিকারের কাহিনির